বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বিজ্ঞান অন্বেষক

ADMISSION GOING ON
ALBATROSS SCHOOL
(Near- Kanchrapara College)
Contact No. 25855868, 9339425472
Bengali Medium : Nursery– u-IV
English Medium : Nursery– u-VI
Office Hour : 10.00 am–12.30pm

বর্ষ -৩ | দ্বিতীয় সংখ্যা | মার্চ-এপ্রিল /২০০৬ | RNI No. WBBEN/03/11192 | দাম ১টাকা

পাখিদের কথা

ময়না

মানুষের মতো কথা বলা পাখি হিসাবে ময়নার পরিচিতি ও সমাদর সর্বত্র। শালিক জাতীয় পাখি ময়না লম্বায় ৮–১০ ইঞ্চি হয়। চকচকে কালো রঙের পালকে সমস্ত শরীর ঢাকা থাকে। পালকের কালো রঙের ওপর সবুজ ও বেগুনি আভা থাকে। ডানার নিচের দিকের কয়েকটি মাত্র পালক সাদা হয়। ঠোঁট লালচে কমলা হয়। ঠোঁটের অগ্রভাগে হলুদের ছোঁয়া থাকে। পা হলদে-কমলা ঘেঁষা হয়। চোখের তলা দিয়ে পালকহীন উজ্জ্বল হলুদ, একফালি নরম চামড়া পেছন দিয়ে ঘাড়ের ওপর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এই

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

মিঠাইবাবা

প্রচলিত বিশ্বাস : হাত বুলিয়ে দিলে রোগ সেরে যাবে, স্বাদ মিষ্টি হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান : খবরের কাগজে মাঝে মধ্যেই শোনা যায় মিঠাইবাবা হাত দিয়ে যা কিছু ছুঁয়ে দিচ্ছেন বা স্পর্শ করছেন তার স্বাদ মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। জল, ইট, পাথর, বাড়ীর জানালা, দরজা, হাত-পা, শরীর—যেকোনও জায়গায় / স্থানে হাত ছোঁয়াচ্ছেন সেখানেই জিভ দিয়ে চাটলে মিষ্টি লাগছে। প্রচারের জোরে অলৌকিকত্ব জেগে উঠছে, বাড়ছে রমরমা। রোগী আসছে, ভক্ত

এরপর ৬ পাতায়

কোলকাতা সুউচ্চ অট্টালিকার জন্য কতটা প্রস্তুত

মানবজীবনের তিনটি মৌলিক চাহিতা খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান। প্রাচীনকালে রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নগর। ব্যবসাকেন্দ্রকে ঘিরে গড়ে উঠেছে জনপদ। প্রাচীনকাল থেকেই কর্মহীনতা মানুষকে নগরমুখী করেছে। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য আকৃষ্ট করেছে মানুষকে। নগরের আয়তন বেড়েছে। নগরের চারপাশের কৃষিজমি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়েছে। আধুনিক কালে নগর কেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। গড়ে উঠেছে মহানগরী। এমনই এক মহানগরী কোলকাতা। ব্রিটিশ আমলে ভারতের রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্র হওয়ার দরুণ কোলকাতা সারা ভারতের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারতবাসী কোলকাতামুখী হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অন্যান্য চাপের সাথে বাসস্থানের চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাসস্থানের চাহিদা মেটানোর জন্য কোলকাতার বুকে একের পর এক গগনচুম্বী অট্টালিকা গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোলকাতা নিজে কতটা প্রস্তুত এই গগনচুম্বী অট্টালিকার জন্য? কতটা নিরাপদ এই অট্টালিকার সারি? এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উত্তর খুঁজেছেন ইনস্টিটিউট অব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারস্ (U.K.) এর ভারতের প্রতিনিধি (পূর্বাঞ্চল) শ্রী দেবব্রত কর এফ আই সি ই তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধে 'কলকাতা সুউচ্চ অট্টালিকার জন্য কতটা প্রস্তুত'। এখানে তাঁর গবেষণাপত্রের মূল বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হল।

১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসনকালের প্রায় ১৫০ বছর ধরে কোলকাতা ভারতের রাজধানী ছিল। ব্রিটিশরা এই শহরকে ১০ লক্ষ লোকের বাসস্থান হিসাবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিল। কোলকাতার আশেপাশের এলাকা ধরলে এই সংখ্যাটা সর্বাধিক ৩০ লক্ষ ছিল। ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গে থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষের চাপে কোলকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কোলকাতার আশেপাশের এলাকার দ্রুত নগরায়ণের ফলে এই জনসংখ্যার চাপ দ্রুত বাড়তে থাকে। বর্তমানে বৃহত্তর কোলকাতার জনসংখ্যা ১ কোটিরও বেশি। কোলকাতার মূল শহরে স্থানাভাবের দরুণ বহুতল নির্মাণের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং এই বহুতলগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় সহায়ক ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই গড়ে ওঠে। সম্ভবত কোলকাতার ভাগ্য ব্যাঙ্গালোরের মতোই হবে। অতীতে যার পরিচিতি ছিল উদ্যান শহর হিসাবে বর্তমানে যার পরিচিতি

এর পর ২ পাতায়

অতিশৈত্যের জগৎ

সালটা ১৯৩৭। ক্যামেরলিঙ্ ওনেস্ হিলিয়াম গ্যাসকে তরলে পরিণত করতে পারলেন। হিলিয়ামকে তরলে পরিণত করা এর আগে পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল এক মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ। -২৬৯° সেলসিয়াস উষ্ণতায় হিলিমায় গ্যাস তরলে পরিণত হল। এখন উষ্ণতা যদি আরো কমানো যায়, -২৭১° সেলসিয়াসে হিলিয়ামের আপেক্ষিক তাপের হঠাৎ একটা পরিবর্তন ঘটে। আপেক্ষিক তাপের হঠাৎ পরিবর্তনের তাপমাত্রাকে বলে ল্যাম্বডা বিন্দু। যে হিলিয়ামের তাপমাত্রা ল্যাম্বডা বিন্দুর চেয়ে বেশি, তাকে বলা হয় হিলিয়াম- I, আর যে হিলিয়ামের তাপমাত্রা ল্যাম্বডা বিন্দুর চেয়ে কম, তাকে বলা হয় হিলিয়াম II। হিলিয়াম II আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে তাপ পরিবহন করতে পারে। এছাড়া, হিলিয়াম II এর সান্দ্রতা শূন্য। এটি একেবারে বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হতে পারে। হিলিয়াম II-এর আশ্চর্য গুণের নাম বিজ্ঞানী কাপিৎজা দিলেন অতি তারল্য (Super Liquidity)।

এই কী তবে অতিশৈত্যের শেষ সীমা? না, বিজ্ঞানীরা -২৭৩.২° সেলসিয়াসের আরো কাছাকাছি পৌঁছাতে পেরেছেন। রুদ্ধতাপ বিচুম্বকণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ০.০০০০০১ কেলভিনের কাছাকাছি তাপমাত্রা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। অতিশৈত্য কাকে

এর পর ৬ পাতায়

কোলকাতা কতটা প্রস্তুত

১ পাতার পর

আতঙ্কের শহর হিসাবে। কোলকাতা বিভিন্ন ক্ষেত্রের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে ফলে ভবিষ্যতে কি হবে তার চিন্তা না করেই বহুতলের ঘনবসতি গড়ে উঠছে। কোলকাতায় এখন সত্যি সত্যিই Real astate এর বিস্ফোরণ ঘটেছে।

কিন্তু আমাদের সামনে রয়েছে কিছু প্রশ্ন। কিছু সমস্যা। অবিলম্বে যে সমস্যাগুলির প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার সেইরকম কিছু ক্ষেত্র এখানে আলোচনা করা হল।

১। **জনবহুল এলাকায় বহুতল নির্মাণ** : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শহরের কেন্দ্রস্থলে জনবহুল এলাকায় বহুতল নির্মাণ করা হচ্ছে কিন্তু এর দরুণ যে যানবাহন পথচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।

২। **অগ্নি নিরাপত্তা** : কত উচ্চতা পর্যন্ত দমকলের অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা কাজ করতে পারবে সেই তথ্য বিবেচনা না করেই অতি উচ্চ (৩৪ তলা পর্যন্ত) বহুতল নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক প্রেস রিপোর্ট অনুযায়ী এই উচ্চতা ১৭ তলা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

৩। **রিয়েল এস্টেট** : বহুতলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বাসস্থানের সমস্যা মেটায় না। কারণ যারা এই বহুতলে ফ্ল্যাট কেনেন তাদের অধিকাংশেরই এই শহরে বা শহরের আশেপাশে স্থায়ী বাসস্থান আছে। তারা ফ্ল্যাট কেনেন ভাড়া দেওয়ার জন্য বা অন্য কাজের জন্য। তাই বাসস্থানের সমস্যা থেকেই যায়।

৪। **অতিরিক্ত যানবাহন** : যানবাহন কেনার জন্য বিভিন্ন সংস্থা অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার ফলে ব্যক্তিগত যানবাহনের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে, কিন্তু রাস্তাঘাটের তেমন বৃদ্ধি ঘটেনি। ফলে এই অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে যানবাহন পরিচালন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে।

৫। **ফ্লাইওভার ও সাবওয়ে নির্মাণ** : অতিরিক্ত যানবাহনের চাপ সামাল দেওয়ার জন্য ফ্লাইওভার ও সাবওয়ে নির্মিত হচ্ছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পথচারীদের কথা এবং রাস্তার বিভিন্ন মোড়ের কথা অনেক ক্ষেত্রেই বিবেচনা করা হচ্ছে না। ফলে এই দুই রাস্তা সকলে ব্যবহার করতে পারছেন না।

৬। **ভূ-গর্ভস্থ জল উত্তোলন** : অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুতলগুলিতে ২৪ ঘণ্টা জলের ব্যবস্থার জন্য গভীর নলকূপ ব্যবহার করে প্রচুর জল তোলা হচ্ছে। এর ফলে অমূল্য ভূগর্ভস্থ জলের পরিমাণ কমছে এবং ব্যাপকহারে ভূমি ধ্বসের আশঙ্কা বাড়ছে। ভবিষ্যতে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে এবং উচ্চতাসম্পন্ন বিভিন্ন স্থাপত্যের ক্ষতি হতে পারে।

৭। **সবুজ ধ্বংস** : বহুতল নির্মাণের জন্য অনেকসময় ব্যাপকহারে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এর ফলে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেসব গাছ লাগানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই পরিচর্যার অভাবে মারা যাচ্ছে। বেঁচে যাওয়া গাছগুলি পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার মতো বড় হতে সময় নেবে।

৮। **জলাশয় বুজিয়ে ফেলা** : বহুতল নির্মাণের জন্য অনেক সময় আইনের তোয়াক্কা না করেই বিভিন্ন জলাশয় বুজিয়ে ডাঙা জমিতে পরিণত করা হচ্ছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে পরিবেশের উপর।

৯। **বৃষ্টির জল সংরক্ষণ** : বর্তমানে বহুতলের ছাদে বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য আইন চালু করা হয়েছে। ছাদে জল আটকে পরে তা ব্যবহারের জন্য বলা হচ্ছে। যদিও বহুতলগুলি যে জল আটকাবে তার পরিমাণ বহুতলের ব্যবহৃত জলের তুলনায় অনেক কম। আর এই পদ্ধতি প্রকৃত বৃষ্টির জল সংরক্ষণ নয়। প্রকৃত সংরক্ষণে বৃষ্টির জলের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ জলের তল বৃদ্ধি করা হয়। বহুতলগুলির ব্যবহৃত জলের পুনঃব্যবহার ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

১০। **পয়-প্রণালী ব্যবস্থা** : অধিকাংশ বহুতল পয়-প্রণালীর জন্য স্থানীয় পুরসভার উপর নির্ভর করে। কিন্তু অধিকাংশ পৌরসভার পয়-প্রণালী ব্যবস্থাই অতিরিক্ত চাপ নিয়ে চলেছে। অনেক বহুতলের মধ্যেই নিজস্ব পয়-প্রণালী ব্যবস্থা আছে তবে তা নিয়ম অনুযায়ী তৈরি নয়।

১১। **কঠিন বর্জ্য** : কঠিন বর্জ্যের ক্ষেত্রেও বহুতলগুলি পৌরসভার উপর নির্ভর করে এবং এক্ষেত্রেও পৌরসভা আর চাপ নিতে অক্ষম।

১২। **বিদ্যুৎ** : বহুতলগুলি বিদ্যুতের জন্য সম্পূর্ণভাবে CESC, WBSEB এর নির্ভরশীল। তবে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুতের জন্য বহুতলগুলি বিকল্প ব্যবস্থা রাখে ও ব্যবহার করে যা শব্দদূষণ ও বায়ুদূষণ ঘটায়। বর্তমানে সোলার ওয়াটার হিটার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হলেও অধিকাংশ বহুতলে এই ব্যবস্থা চালু হয়নি।

১৩। **মাটির অবস্থা** : কোলকাতার মাটি কাদা মাটি এবং মাটির তলায় উপযুক্ত গভীরতায় কোন ভারবহনকারী শক্ত স্তর নেই। বহুতল নির্মাণকারীদের এই বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে এবং বহুতলের নকশার সময় মাটি পরীক্ষা করে ভিত ও উপরের অংশের বিষয়ে চূড়ান্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

১৪। **ভূমিকম্প** : কোলকাতা ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা নয়, যদিও বিশেষজ্ঞরা অদূর ভবিষ্যতে আসাম ও কোলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে ভূমিকম্পের আশঙ্কা করছেন। বহুতলের নকশার সময় এই ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা দরকার।

পরিশেষে একথা বলা যায় কোলকাতা এখন বহু সংখ্যক বহুতলের যথেষ্ট উপযুক্ত নয়। নির্মীয়মান বহুতলগুলি কোলকাতার ভালোর বদলে খারাপ করবে এই আশঙ্কাই বেশি। বহুতলের বিষয়ে নতুন ভাবনা এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিকল্পনা ভবিষ্যতের জন্য জরুরী। রিয়াল এস্টেট বিস্ফোরণের ফলে উঁচু, আরো উঁচু বহুতলের এই উন্মাদনা দীর্ঘকালের জন্য টিকে থাকা ব্যবস্থা হতে পারে না বলে প্রমাণিত হবে। কোলকাতার ক্ষেত্রে দরকার আনুভূমিক বিস্তার। উলম্ব বিস্তার নয়। কোলকাতাকে মাটি ছুঁয়েই থাকতে হবে। আকাশ ছোঁয়ার চেষ্টা তার পক্ষে ক্ষতিকর। শহরের পরিকল্পিত বিস্তারের ফলে কোলকাতার চাপ কমবে এবং কোলকাতার বাইরে কর্মসংস্থানেরসুযোগ ঘটবে। আনন্দের সঙ্গে একথা উল্লেখ করা যায় যে এই লক্ষ্যে কাজ শুরু হয়েছে। আসানসোল, শিলিগুড়ি, বোলপুর, শান্তিনিকেতনের উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : শ্রী দেবব্রত কর, এফ আই সি ই,
ভারতের প্রতিনিধি ইনস্টিটিউট অব সিভিল ইঞ্জিনীয়ারস্ (U.K)।

পাখিদের কথা

১ পাতার পর

নরম চামড়ার আকার ও উজ্জ্বলতা দেখে, ময়না উপজাতি চেনা যায়।

ময়না মাটির ওপর ভালভাবে হেঁটে চলতে পারে না। অনেকটা চড়ুই পাখির মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। পোকামাকড়, শিমুল, রক্তমাদার প্রভৃতি ফুলের মকরন্দ খেতে ভালবাসে। ওড়ে সোজাভাবে। শূন্যে উড়ে উই বা পিঁপড়ে ধরনের পতঙ্গ খেতে পারে। জোরে ওড়ার সময়ে ডানায় শব্দ হয়। পোষা ময়নার খাদ্য ফল, পোকা, ভাত ও ছাতু ইত্যাদি।

খাঁচায় পোষা পাখির মধ্যে সবচেয়ে ভাল কথা বলতে পারে ময়না, সহজেই মানুষের ঠোঁট নাড়া দেখে স্বর নকল করতে পারে। এদের শোনার ও কথা বলার ক্রিয়াকলাপ ধীরগতি সম্পন্ন। ফলে মুখ থেকে বেরিয়ে আসা শব্দ মানুষের কণ্ঠস্বরের মত মনে হয়। ময়না মানুষের স্বর নকল করে বটে, অর্থ কিন্তু বোঝে না।

প্রজননের সময় ছাড়া ময়না ছোট বা বড় দল বেঁধে বিচরণ করে। সাধারণত গাছের মগডালেই বিচরণ করতে ভালবাসে। বাসা বাঁধে, শত্রুর নাগালের বাইরে, গাছের গর্তে। পরিত্যক্ত গর্ত না পেলে, নিজেই গর্ত করে নেয়, মাটি থেকে ২০-৭০ ফুট উঁচুতে গাছের কান্ডে। গর্তের ভেতরে পালক, পাতা ও ছালবাকলের নরম আঁশ দিয়ে, নরম আস্তরণ করে, তার ওপর ২-৩টি ডিম পাড়ে। ডিমের রঙ গাঢ় নীল, তার ওপর লালচে পাটকিলে ছোপ।

ময়না পাওয়া যায়, ভারত, শ্রীলঙ্কা, মালয়, মায়নমার, সুমাত্রা, জাভা ও বোর্নিওতে। ভারতে যে ময়না পাওয়া যায়, তাদের পাঁচটি প্রজাতিতে ভাগ করা হয়। এদের প্রত্যেকেরই ঘাড়ের ঝালরের পার্থক্য সহজে নজরে পড়ে। চতুর্থ প্রজাতিটির নাম গ্র্যাকুলা রিলিজিওসা আন্দামেনসিস। কলকাতার বাজারে সচরাচর এদেরই দেখতে পাওয়া যায়।

—শৈবাল কুমার গুহ, ৫/৩-এ, ওলাই চণ্ডী রোড, বেলগাছিয়া, কল-৩৭

ফর্ম : IV

রেজিস্ট্রেশন অব নিউজপেপারস (সেন্ট্রাল) রুলস১৯৫৬-এর ৮ম ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত তথ্যসমূহ প্রকাশ করা হচ্ছে :

১। **প্রকাশ স্থান** : ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫

২। **প্রকাশকাল** : দ্বিমাসিক

৩। **প্রকাশক** : জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৪। **সম্পাদক** : শিবপ্রসাদ সরদার
কেডিয়াবাগান, জোনপুর, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৫। **মুদ্রক** : জয়দেব দে
ক্রীন আর্ট, ২০, নেতাজী সুভাষ পথ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

৬। **স্বত্বাধিকারীর নাম** : জয়দেব দে
৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড,কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা। পিন- ৭৪৩১৪৫
নাগরিকত্ব : ভারতীয়

আমি জয়দেব দে এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ : ৮ মার্চ, ২০০৬

জয়দেব দে
প্রকাশকের স্বাক্ষর

মাকড়সার জাল, জালের রহস্য

'জাল'— শব্দটা ছোট হলেও রহস্যময়তা যেন তাকে সব সময় ঘিরে রয়েছে। ম্যাজিকের প্রতীক থেকে বড় বাজেটের ছবি 'স্পাইডার ম্যান' সবই এই জালকে কেন্দ্র করেই তৈরি। এর বিচিত্র গঠনশৈলী ও ফাঁদ হিসেবে এর অনুপম উপযোগিতা সেই প্রাচীন কাল থেকেই মানুষকে করে তুলেছে বিস্ময়াবিষ্ট।

মাকড়সার জাল তৈরির উপাদান হল সিল্ক। এই সিল্ককে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাকড়সা সিল্ক নামে উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তা ব্যর্থ হয়েছে। রেশম কীট সহ আরও কিছু ধরনের পতঙ্গ ও সিল্ক নিঃসরণ করতে পারে কিন্তু তারা জীবনের একটা বিশেষ সময়েই এটা করতে পারে। কিন্তু মাকড়সা যে কোন সময়েই প্রয়োজন অনুসারে তার দেহ থেকে সিল্ক নিঃসরণ করতে পারে। তাই মাকড়সা জাল ছিঁড়ে দিলেও তার খাবারের অভাব হয় না। সে আবার জাল তৈরি করতে পারে।

মাকড়সার পেটের শেষের দিকে একটা বিশেষ গ্রন্থিতে তৈরি হয় এই সিল্ক। এই গ্রন্থি থেকে রস নিঃসৃত হয়ে 'স্পিনারেট' নামের সূক্ষ্ম ছিদ্র সমন্বিত অঙ্গের মধ্য দিয়ে বাইরে আসে। এই রস বাতাসের সংস্পর্শে এসে কঠিন হয়ে সুতোর আকার নেয়।

মাকড়সার জাল দেখতে একরকম হলেও একরকম নয়। প্রতিটি মানুষের অঙ্গুলার ছাপ ও জিবের ছাপ যেমন আলাদা তেমনই আলাদা। একটু ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলেই এই পার্থক্য ধরা পড়বে। মাকড়সার জালের সুতো গুলো খুব সূক্ষ্ম হলেও খুবই মজবুত। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে একইমাপের ইস্পাতের তারের তুলনায় এটা বেশি শক্ত।

একবার বিজ্ঞানী এইচ এম পিটারস্ এক অভিনব পরীক্ষা চালিয়েছিলেন মাকড়সার জালের উপরে। স্বাভাবিকভাবে শিশু মাকড়সা ডিম ফুটবার সাথে সাথেই ডিম থেকে বের হয় না। কিছু সময় পরে বের হয়। পিটারস্ সাহেব একটি শিশু মাকড়সাকে ডিম ফুটবার সাথে সাথেই বের করে আনলেন। স্বাভাবিক ভাবে শিশু মাকড়সার জাল কিছুটা ছোট হলেও দেখতে পূর্ণবয়স্ক মাকড়সার জালের মতোই হয়। কিন্তু দেখা গেল যে মাকড়সাটি তিনি বের করেছিলেন সেটির তৈরি প্রথম জালটি রীতিমতো অগোছালো হয়ে যেন একগোছা জট পাকানো তন্তুতে পরিণত হল। কিন্তু পরবর্তী জালগুলো সাধারণ আকারেরই হল। বহু বিজ্ঞানী মাকড়সার জাল নিয়ে পরীক্ষা করে বহু আকর্ষণীয় তথ্য দিয়েছেন। মাকড়সার কেন্দ্রীয় স্নায়ুগ্রন্থিতে লেসার রশ্মি প্রয়োগ করে দেখা গেছে, কম তন্তু বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত সরল জাল তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন ওষুধ ও চিনির জল মাকড়সাকে পান করিয়েও জালের গঠনের নানা পরিবর্তন দেখা গেছে।

মাকড়সার জাল নিয়ে নানা দিকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কম্পিউটারকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এই বিশাল কর্মকাণ্ডে অনেক অজানা তথ্য বেরিয়ে আসবে বলেই বিজ্ঞানী মহল ও আমরা আশা করছি।

—সুমন চন্দ, বিজ্ঞানকর্মী।

গবেষণাপত্র

ভারতবর্ষের অন্তর্গত সুন্দরবন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জলের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ

সংক্ষিপ্তসার : ভারতবর্ষের অন্তর্গত সুন্দরবন ৩৪টি ম্যানগ্রেভ প্রজাতি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এই অঞ্চলে নানারকম প্ল্যাঙ্কটন, নেক্টন, বেন্থস প্রভৃতি দেখা যায়। সম্প্রতি ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সুন্দরবন অঞ্চলের চারটি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র যথাক্রমে কুলটী, মালঞ্চ, ধামাখালি ও ছোটমোল্লাখালি থেকে জল সংগ্রহ করে তার বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম যেমন নিউট্রিয়েন্টের (NO_3^-, PO_4^{3-}) পরিমাণ, দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O), PH, স্যালিনিটি, জলের তাপমাত্রা প্রভৃতি নির্ণয় করা হয়েছে। প্রাপ্ত ফল থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে যে সুন্দরবন অঞ্চলের জলের গুণগত মান দিনে দিনে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কোলকাতা শহরের পৌর ও কলকারখানা নির্গত দূষিত জলকে। এই দূষিত জল DWF এবং SWF ক্যানাল দিয়ে নির্গত হয়ে বিদ্যাধরী ও মাতলা নদী দিয়ে বাহিত হয় এবং সুন্দরবনের পূর্ব অঞ্চলে নিক্ষিপ্ত হয়। বিভিন্ন চিংড়ি উৎপাদন কেন্দ্র এবং ইঁট তৈরির কারখানা থেকে নির্গত দূষিত জলও এখানে এসে জমা হয়। কুলটী লক গেট থেকে সংগৃহীত জলে নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ অন্য তিনটি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্রের জলের নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশি। এই তথ্য প্রমাণ করে যে মানুষের নিয়ামক প্রভাবই কুলটী অঞ্চলের এই অধিক মাত্রায় জলদূষণের জন্য দায়ী এবং এই নিয়ামক প্রভাব অন্য তিনটি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র বিশেষত ছোট মোল্লাখালি অঞ্চলে অনেক কম।

সূচনা : ভারতবর্ষ অন্তর্গত সুন্দরবন অঞ্চল বহুবিধ ম্যানগ্রোভ প্রজাতির উদ্ভিদ এবং তার অন্তর্গত প্রাণীকুল সমন্বিত পরিবেশ যা ২১°১৩ উত্তর — ২২°৪০ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০৩ পূর্ব — ৮৯°০৭ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। সুন্দরবনের পশ্চিমে রয়েছে হুগলীনদী, পূর্বে ইছামতী, কালিন্দী ও রায়মঙ্গল নদী, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে রয়েছে ডাম্পিয়ার হজেস্ লাইন। সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চল কাদামাটি, বালিয়াড়ি, খাঁড়ি, নদীমোহনা নিয়ে গঠিত। সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চল শুধুমাত্র কোলকাতা, হলদিয়া, হাওড়া, ২৪ পরগনা ইত্যাদি অঞ্চলগুলিকে ঝড় বা প্লাবনের হাত থেকে রক্ষা করে তাই নয়, একই সঙ্গে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ (তপসে, ইলিশ, ভেটকি, পার্শে, সার্ডিন), প্ল্যাঙ্কটন (ফাইটো-প্ল্যাঙ্কটন এবং জু-প্ল্যাঙ্কটন), আর্থোপডা (গলদা চিংড়ি, সমুদ্র কাঁকড়া, লাল কাঁকড়া), মোলাস্কা (ম্যাকোমা, রাজকাঁকড়া, সেরিথেডিয়া, অয়েস্টার, টেলিস্কোপিয়াম) প্রভৃতির জীববৈচিত্র্য বজায় রেখে প্রাকৃতিক ভারসাম্য অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করছে।

কিন্তু বর্তমানে সুন্দরবন অঞ্চলের বিদ্যাধরী এবং মাতলা নদীর জলের গুণগত মান দিনেদিনে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে এবং জলদূষণের ফলে এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

সম্প্রতি সুন্দরবন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চারটি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র যথাক্রমে কুলটী লকগেট, মালঞ্চ, ধামাখালি ও ছোটমোল্লাখালি অঞ্চল থেকে জলসংগ্রহ করে তার কয়েকটি ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং জলদূষণের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব হয়েছে।

ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম পরিমাপন পদ্ধতি :-

চারটি নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র যথাক্রমে কুলটী লক গেট, মালঞ্চ, ধামাখালি এবং ছোট মোল্লাখালি অঞ্চলের জল সংগ্রহ করে তার যে সমস্ত ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেগুলি হল —

ভৌত-রাসায়নিক ধর্ম	ব্যবহৃত যন্ত্র
১) তাপমাত্রা	সেলসিয়াস থার্মোমিটার
২) স্যালিনিটি	রিফ্র্যাক্টোমিটার
৩) P^H	ডিজিটাল P^H মিটার (ইলেক্ট্রোমেট্রিক পদ্ধতি)
৪) ডিসলভড্ অক্সিজেন (D.O)	ডিসলভড্ অক্সিজেন মিটার
৫) NO_3^- এবং PO_4^{3-} নিউট্রিয়েন্ট	সুক্ট্রোফোটোমেট্রিক পদ্ধতি

প্রথম চারটি প্যারামিটার সংগ্রহ স্থলেই পরিমাপ করা হয়েছে পঞ্চম প্যারামিটারটির পরীক্ষাগার পরীক্ষা পদ্ধতি নিম্নে দেওয়া হল—

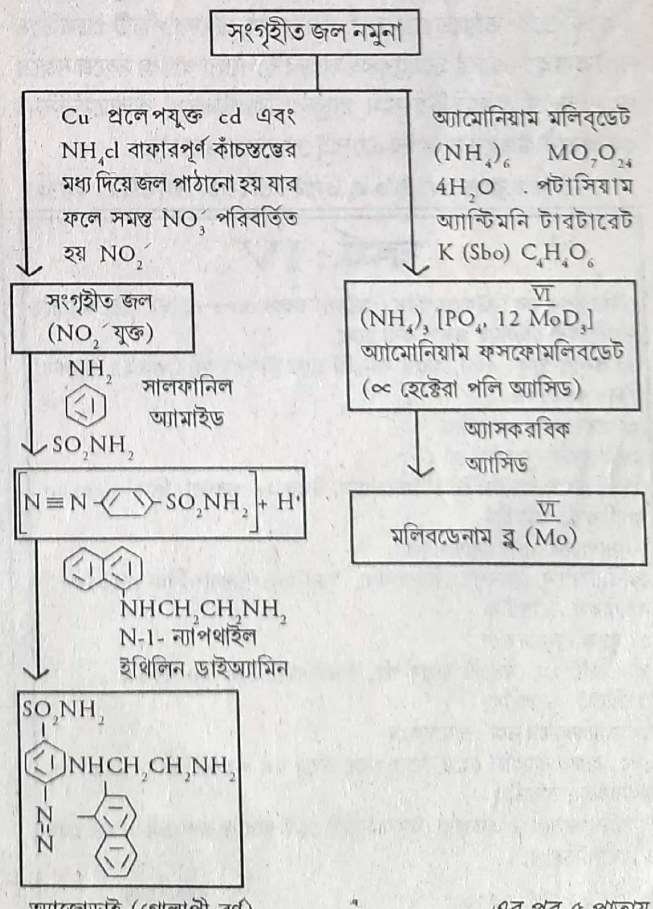

এর পর ৫ পাতায়

ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম বিশ্লেষণ

৪ পাতার পর

অ্যাজোডাই এবং মলিবডেনাম ব্লু-র অপটিকাল ডেনসিটি (OD) মাপা হয় স্পেকট্রোফোটোমিটার যন্ত্রের মাধ্যমে। বিভিন্ন ঘনত্বের দ্রবণের OD মেপে একটি ক্যালিব্রেশন গ্রাফ অঙ্কন করা হয় এবং নমুনাতে অবস্থিত NO_3^- এবং NO_4^{3-} র পরিমাণ নির্ণয় করা হয় $mgatomL^{-1}$

প্রাপ্ত ফল ও আলোচনা :-

সারণী ১

নমুনা সংগ্রহ কেন্দ্র	জলের তাপমাত্রা (°c)	স্যালিনিটি (ppt)	P^H	DO (mg L^{-1})	NO_3^- (mgatom L^{-1})	PO_4^{3-} (mgatom L^{-1})
কুলটী লকগেট (ডিসেম্বর'০৫)	২৬.৩	২.৫	৭.৪১	৩.৯৮	২৮.৫৬	৪.৩১
মালঞ্চ (ডিসেম্বর '০৫)	২৬.৪	৫.০৩	৭.৮	৪.৩	২৩.২	২.১৫
ধামাখালি (ডিসেম্বর '০৫)	২৬.৪	৬.১১	৭.৮৫	৪.৮২	২১.০৫	২.১৩
ছোটমোল্লাখালি (ডিসেম্বর '০৫)	২৬.৫	১৮.০৫	৭.৬	৫.১৫	১৮.১২	১.৩১
ছোটমোল্লাখালি (জানুয়ারি '০৬)	২১.১	১৬	৭.৪	৫.৭	১৫.২	১.০৫
ছোটমোল্লাখালি (ফেব্রুয়ারি '০৬)	২২.৫	১৭	৭.৫	৫.২৫	১০.৭১	০.৭১

সারণী ১ থেকে দেখা যাচ্ছে যে জলের P^H র মান ৭.৪১ থেকে ৭.৮৫-র মধ্যে রয়েছে। সমুদ্রের জলের স্বাভাবিক P^H সাধারণত ৮.২ কুলটী লক গেটের P^H ফল ৭.৪১ যার সম্ভাব্য কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে,

১) কোলকাতা শহরের সমস্ত দূষিত জল ও নর্দমার ময়লা আবর্জনা প্রভৃতি DWF এবং SWF ক্যানাল দিয়ে বাহিত হয়ে প্রথমে কুলটী লক গেটেই এসে জমা হয় এবং তারপরে তা বিদ্যাধরী, মাতলা প্রমুখ নদীর মাধ্যমে অন্যান্য অঞ্চল ছড়িয়েপড়ে।

২) কলকাতা ও তার সংলগ্ন অঞ্চলের কলকারখানা থেকে নির্গত দূষিত জল ও দূষক (পলিউট্যান্ট) এই কুলটী লক গেটেই এসে জমা হয়।

৩) এছাড়া এখানে কিছু চিংড়ি উৎপাদনকেন্দ্র থেকে যে জল নির্গত হয়, তাতে H_2S, NH_3-র পরিমাণ অত্যন্ত বেশি।

তাই কুলটী লক গেটে অ্যানথ্রোপোজনিক স্ট্রেসের পরিমাণ অনেক বেশী। দ্রবীভূত CO_2 কার্বনিক অ্যাসিড (H_2CO_3) তৈরি করে যার ফলে জলে H^+-র ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ও P^H-র মান ৭.৪১ এ নেমে যায়।

D.O-র ফল থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কুলটী লক গেট সিউয়েজ পলিউশান দ্বারা আক্রান্ত। কারণ যেখানে নদীর জলের স্বাভাবিক D.O ফল হওয়া উচিত ৬.৫ mgl-1, সেখানে কুলটী লক গেটে D.O-র মান ৩.৯৮-এর থেকে প্রমাণ হয় কুলটী লক গেটে মাইক্রোবিয়াল বিয়োজন অত্যন্ত বেশি কারণ জৈবপ্রধান বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি। অন্যান্য স্টেশন যথাক্রমে মালঞ্চ, ধামাখালি, ছোটমোল্লাখালিতে দূষণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃতভাবে কম কারণ এই বর্জ্য, দূষক পদার্থ ক্রমশ লঘু হয়ে মাতলা ও বিদ্যাধরী নদীর মাধ্যমে এই অঞ্চলগুলিতে পৌঁছায়।

কুলটী লক গেটে NO_3^- এবং PO_4^{3-} নিউট্রিয়েন্টের পরিমাণও অনেক বেশি। তার ফলে এখানে ইউট্রফিকেশন অর্থাৎ অবাঞ্ছিত শৈবাল বৃদ্ধি দেখা যায়। যার ফলে জলের জৈব বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ সাধন ঘটে। এবং জলের গুণগত মান দিনেদিনে অবক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলছে।

সিদ্ধান্ত : জলদূষণের ফলে সুন্দরবন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র যেমন একদিকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে, তেমনি অন্যদিকে জনজীবন ও বিপর্যস্ত হচ্ছে। এই জলদূষণের ফলে ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন, ইক্থিওপ্ল্যাঙ্কটন প্রভৃতির প্রজাতিগঠন পরিবর্তিত হচ্ছে। সুন্দরবনের নদী-নালায় দূষণের প্রাদুর্ভাব সম্ভবত কোলকাতার পূর্বাঞ্চলের অপরিকল্পিত নগরোন্নয়নের পরিণাম। কোলকাতা শহরের বর্জিত নোংরা জল আগে কোলকাতার পূর্বদিকে অবস্থিত জলাভূমিতে (wetland) প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বিশোষিত হত। জলাভূমি ভরাট হতে থাকায় সেই নোংরা জল বিদ্যাধরী, মাতলা প্রভৃতি নদীতে গিয়ে মিশছে। সমাজের অর্থাৎ আমাদেরই অপরিণামদর্শিতায় সুন্দরবনের এই জলদূষণ আশঙ্কাজনক আকার ধারণ করেছে।

বর্তমানে এই অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে হলে নগরায়ণের পরিকল্পনা যেমন বিজ্ঞানসম্মত হওয়া প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজনীয় আরও Sewage Treatment Plant তৈরি এই বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার অঙ্গ হওয়া উচিত। এছাড়া অবাঞ্ছিত শৈবালকে কম্পোস্ট তৈরির কাজে লাগালে শুধু মানুষের উপকারণ হবে না, বাস্তুতন্ত্রের বর্জ্য পদার্থের রিসাইক্লিংও যথাযথভাবে সম্ভব হবে এবং দূষণের পরিমাণও অপেক্ষাকৃতভাবে কম করা সম্ভব হবে।

—অমৃতা সরকার, মেরিন সায়েন্স বিভাগ,
বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি। একে বাঁচান।

HP GAS your friendly gas
H.P. GAS
(A Govt. of India Enterprise)
By Hindustan Petroleum Corpn. Ltd.
Distributor
Kanchrapara
H.P. Gas Service
30, Rajani Babu Rd.,
Kanchrapara
Ph: 2585-5221
(New Connection available here Rs. 1850 only, including Oven, Accessories & Insurance)

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

১ পাতার পর

জোগাড় হচ্ছে, প্রচুর প্রণামী আসছে। এভাবে অলৌকিক ক্ষমতা প্রচার হয়ে যায়।

মিঠাইবাবার অলৌকিকত্ব বিজ্ঞানের সাহায্যেই করা যায়। স্যাকারিন বা সুইটেক্স (ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়, ডায়াবিটিস রোগীরা চিনির বদলে সুইটেক্স ব্যবহার করে) চিনির থেকে প্রায় ৩০০ গুণ বেশি মিষ্টি। এছাড়া ডালমিটল্ স্টেভিওসাইড ধরনের রাসায়নিক (উদ্ভিদজাত) মিশ্রণগুলি চিনির চেয়ে ৩০০ গুণ বেশি মিষ্টি। এর যেকোন একটি হাতে ভালোভাবে ঘষে নিয়ে যেকোন ব্যক্তি তার হাত যেখানেই স্পর্শ করবেন বা হাত ছোঁয়াবেন সেখানেই মিঠাইবাবার উদয় হবে অর্থাৎ মিষ্টি স্বাদ লাগবে। স্যাকারিন বা সুইটেক্স জাতীয় রাসায়নিক মিশ্রণগুলি হাতে যখন ভালোভাবে ঘষে নেওয়া হয় তখন দীর্ঘ সময় হাতে সেই মিষ্টি স্বাদ থেকে যায় (যেহেতু স্যাকারিন বা সুইটেক্স চিনির চেয়ে ৩০০ এর বেশি গুণ মিষ্টি)। ফলে সাধারণভাবে মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে মিঠাইবাবার মধ্যে অলৌকিকত্ব আরোপিত হয়েছে। অথচ আদৌও তা নয়। ছাত্র-ছাত্রী বা যেকেউ এই অভ্যাস করে মিঠাইবাবার তথাকথিত অলৌকিকত্বের মুখোশ খুলে দিতে পারবেন। পাশাপাশি রোগ সেরে যাওয়ার ঘটনাও পুরোপুরি মিথ্যে।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

অতিশৈত্যের জগৎ

১ পাতার পর

বলা হবে? মোটামুটিভাবে -১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার নীচে তাপমাত্রা নামলে তাকে 'অতিশৈত্য' বলা যাবে। এরকম বলার কারণ হল, বিজ্ঞানীরা দেখেছেন অধিকাংশ স্থায়ী গ্যাসকেই এই তাপমাত্রার উপরে কিছুতেই আর তরলে পরিণত করা যায় না। যেমন অক্সিজেন গ্যাস তরল হয় -১৮২.৯৫° সেলসিয়াস, নাইট্রোজেন তরল হয় -১৯৫.৭৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায়। এধরনের তরলায়িত গ্যাস কিরকম শীতল তা ভাবলে অবাক হতে হয়। বরফের কাছে ফুটন্ত জল যত গরম, তরল অক্সিজেনের কাছে বরফ, তার চেয়েও অনেক বেশি গরম।

এই 'অতিশৈত্য' বিষয়টি বিজ্ঞান জগৎকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। অতিশৈত্যে পদার্থের নানা ধর্মের পরিবর্তন হয়। কোন কোন ধর্ম আমূল বদলে যায়। কখনও বা অতিশৈত্যে পদার্থের নতুন ধর্মের আবির্ভাব ঘটে যা সাধারণ তাপমাত্রায় বা সাধারণ শৈত্যে দেখা যায় না। কেবল জড় জগতেই নয়, জীবজগৎ ও অতিশৈত্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতিশৈত্যে জীবকোষে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘটে। অতিশৈত্যে জড় জগৎ ও জীবজগতের নানা ঘটনা নিয়ে গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা— অতিশৈত্য বিজ্ঞান (Cryogenics)।

কোন কোন পদার্থ অতিশৈত্যে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। তাই সবরকম ধাতু দিয়ে অতিশৈত্যে যন্ত্র তৈরি করা যায় না। অতিশৈত্যে ধাতুদের টানদৃঢ়তা (Tensile Strength) পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে লোহা, টাংস্টেন, মলিবডেনাম প্রভৃতি ধাতুর টান দৃঢ়তা নিম্ন তাপমাত্রায় খুবই বেড়ে যায়। টানদৃঢ়তা বলতে কি বোঝায়? কোন পদার্থের একক দৈর্ঘ্যে একক বল প্রয়োগ করলে, তার দৈর্ঘ্যের যতটা বৃদ্ধি ঘটে তাই হল তার টানদৃঢ়তার পরিমাণ। আবার, অন্যদিকে দেখা গেছে, অতিশৈত্যে তামা, নিকেল, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর টানদৃঢ়তার অতি সামান্য পরিবর্তন ঘটে। এজন্য অতিশৈত্যে যন্ত্রাদি তৈরি করতে সাধারণত দ্বিতীয় ধরনের ধাতুগুলি ব্যবহার করা হয়।

ধাতুদের আপেক্ষিক তাপের প্রসঙ্গে আসি। ধাতুদের আপেক্ষিক তাপের কারণ দুটি —ইলেকট্রনদের আপেক্ষিক তাপ এবং কেলাস জাফরির স্পন্দনজনিত আপেক্ষিক তাপ। উচ্চ তাপমাত্রায় বা সাধারণ তাপমাত্রায় কেলাস জাফরির স্পন্দন খুবই প্রবল হয়ে ওঠে, নিম্ন তাপমাত্রায় সেটি অনেক কমে যায়। তাই নিম্ন তাপমাত্রায় ইলেকট্রনদের আপেক্ষিক তাপ প্রধান হয়ে ওঠে। আবার অধাতব কঠিন পদার্থগুলির ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছুটা অন্যরকম। কঠিন মিথেনের বেলায় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে -২৫২.৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আপেক্ষিক তাপ হঠাৎ প্রচণ্ড বেড়ে যায়। কিন্তু ঐ তাপমাত্রার উপরে বা নীচে আপেক্ষিক তাপের মান অনেক কম। বিভিন্ন কঠিনীকৃত গ্যাসীয় পদার্থ, যেমন কঠিন অক্সিজেন, কঠিন নাইট্রোজেন, কঠিন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতির ক্ষেত্রেও এরকম ব্যাপারটা ঘটে।

নিম্ন তাপমাত্রায় ধাতুর তাপ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে যতই নিম্ন তাপমাত্রার দিকে যাওয়া যায় ততই তাপ পরিবাহিতা কমতে থাকে। বিশুদ্ধ ধাতুর ক্ষেত্রে -২৫৩.২° সেলসিয়াস থেকে -২২৩.২° সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে তাপ পরিবাহিতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। তাপমাত্রা এই সীমায় পৌঁছালে বিশুদ্ধ ধাতুর তাপ পরিবহন ক্ষমতা সংকর ধাতুর তাপ পরিবহন ক্ষমতার প্রায় ১০০ গুণ বেশি হয়। এই তাপমাত্রার নীচে আবার তাপ পরিবাহিতা খুব দ্রুত কমে যায়। অবশ্য সংকর ধাতুদের ক্ষেত্রে তাপ পরিবাহিতা অনেকটা ধীরভাবে কমতে থাকে।

বিশুদ্ধ ধাতুর ক্ষেত্রে তাপমাত্রা কমলে তড়িৎ রোধ দ্রুত কমতে থাকে। সংকর ধাতুর ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায় না। তাপমাত্রা কমলে অর্ধপরিবাহীদের ক্ষেত্রে তড়িৎ রোধ বাড়তে থাকে। নিম্ন তাপমাত্রায় অর্ধপরিবাহীদের রোধ খুবই বেড়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে অর্থ পরিবাহীদের সাহায্যে নির্মিত থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়।

বিভিন্ন রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানার জন্য রোগ জীবাণুগুলিকে দীর্ঘ সময় ধরে নানাভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। নানাপ্রকার ভৌত অবস্থায় জীবাণুগুলিকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা প্রয়োজন। একাজেও অতি হিমায়ন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন রোগের ভ্যাকসিনগুলিকে অতি হিমায়িত করে এখন দীর্ঘকাল সঞ্চিত করে রাখা যাচ্ছে।

ক্যান্সার রোগের গবেষণার ক্ষেত্রে ক্যান্সার রোগগ্রস্ত কোষকে দীর্ঘ সময় ধরে নানা পরিস্থিতিতে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তার জন্য দরকার ক্যান্সার রোগগ্রস্ত কোষকে সংরক্ষণ করা। অতি হিমায়নের সাহায্যে ক্যান্সার কোষকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে তরল ক্রিপটন খুবই কার্যকরী।

কৃত্রিম প্রজননের ক্ষেত্রে অতি হিমায়নের গুরুত্ব অপরিসীম। অতি শৈত্যে শুক্রকীট ও ডিম্বকোষকে দীর্ঘকাল সংরক্ষিত করে রাখা যায়।

মহাকাশ অভিযানে রকেট উৎক্ষেপণে সঠিক জ্বালানী নির্বাচন একটি সমস্যা। রকেট উৎক্ষেপণে কোন কোন দিক থেকে কঠিন জ্বালানীর তুলনায় তরল জ্বালানীর ব্যবহার অধিকতর সুবিধাজনক।

আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার এমন খুব কম দিকই আছে যেখানে অতিশৈত্যের ভূমিকা স্বীকৃত হয়নি।

—গোবিন্দ দাস

পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বিল বিধানসভায় অনুমোদন

১৬ নভেম্বর '০৫ পূর্ব কলকাতা জলাভূমি (সংরক্ষণ ও পরিচালন) অর্ডিন্যান্স ২০০৫ বাতিল হয়ে গত ১০ মার্চ বিধানসভায় ধ্বনি ভোটে পূর্ব কলকাতা জলাভূমি বিল অনুমোদন পেল। ফলে পূর্ব কলকাতায় বেআইনীভাবে কোনও জলাভূমি ভরাট হলে তা জামিন অযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের ৩ বছর জেল এবং ১ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। আইনানুযায়ী কলকাতার ১২,৭৭১ হেক্টর জমি জলাভূমির আওতায় আনা হচ্ছে। তাছাড়া কলকাতা অঞ্চলের জলাভূমির ম্যাপ তৈরি করা হবে যাতে কোনওমতেই জলাভূমি ভরাট না হতে পারে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, গোটা রাজ্যে জলাভূমি সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলাভূমি যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে তাতে স্থানীয় অঞ্চলের পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। আমাদের দাবী— ১) রাজ্যের প্রতিটি জেলাস্তরে জলাভূমি / জলাশয়ের তালিকা (ম্যাপিং) প্রতিটি ব্লক অফিসে / পৌরসভায় টাঙিয়ে রাখতে হবে। ২) জলাভূমি/জলাশয়ের সমীক্ষা ও পরিযায়ী পাখি সহ উদ্ভিদকুল বা প্রাণীকুল-এর বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে হবে। ৩) জেলাস্তরে জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য টাস্কফোর্স তৈরি করতে হবে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস ২০০৬

১৯৯৪ সাল থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, প: ব: সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় যৌথভাবে প্রতিবছরই ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসের আয়োজন করে থাকেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের ও অন্যান্য রাজ্যের বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে নানা ধরনের নতুন গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ২০০০ সাল থেকে নিয়মিতভাবেই এই বিজ্ঞান কংগ্রেসে বিজ্ঞান দরবার সংস্থার কর্মীদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হচ্ছে।

১৩তম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেস '০৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়। ২৬১টি গবেষণাপত্র সংক্ষিপ্তসার সহ বইটি প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকায় বিভিন্ন সংখ্যায় প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার (বাংলায়) প্রকাশ করা হবে। আগ্রহী বন্ধুরা যোগাযোগ করুন বিজ্ঞান অন্বেষকের ঠিকানায় বা লেখকের ঠিকানায় অথবা ই-মেল করুন— ganabijnan@yahoo.co.in. সম্পাদক : বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্তমান সংখ্যায় দুটি গবেষণাপত্র (সংক্ষিপ্তসার) প্রকাশ করা হল। পাঠকদের কাছ থেকে মতামত আহ্বান করা হচ্ছে।

ধরে রাখতে হবে বৃষ্টির জল

আমাদের সুপেয় জলের সবচেয়ে ভাল উৎস বৃষ্টি বা তুষারপাত। এই বৃষ্টির জল ধরে রেখে আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কাজে, যেমন, পানীয় হিসেবে, গৃহস্থালীর কাজে, কৃষিকাজে বা অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। তবে আমাদের রাজ্যে তথা আমাদের দেশে বৃষ্টির জল ধরে রাখা অর্থাৎ বৃষ্টির জল সংরক্ষণের তেমন পরিকাঠামো এখনও গড়ে ওঠেনি।

কেন বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ? ভারতে খর ও বন্যা দুটি অতি পরিচিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বেশ কয়েকটি রাজ্যে খরা একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়ে উঠেছে, যা খুবই চিন্তার কারণ। আবার বেশ কয়েকটি রাজ্য বন্যার কবলে নিয়মিত পড়ছে। যদি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলি সেক্ষেত্রেও বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলাগুলি বছরের বেশী সময়ই জল কষ্টে ভোগে। আর অন্য কয়েকটি জেলাতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বেশ অভাব দেখা যায়। কিন্তু সত্যিই কি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট আছে? আমাদের দেশে মোট যা বৃষ্টি হয় তা দিয়ে গোটা দেশকে এক মিটার মোটা জলের চাদর দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়। এই বৃষ্টির জলের মাত্র ১০ শতাংশ আমরা কাজে লাগাতে পারি। যদি এই বৃষ্টির জলকে বয়ে যেতে না দিয়ে ধরে রাখতে পারি তবে সারা বছর ধরে আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। গোটা দেশ জুড়ে বিশুদ্ধ পানীয় জলের যে হাহাকার চলছে, তা নিশ্চিহ্ন হয়ে অতিরিক্ত জল শিল্প বা অন্যান্য কাজে ব্যয় করতে পারব।

বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার অর্থ হল যেখানে বৃষ্টিপাত হচ্ছে সেখানে সেই জল ধরে রেখে প্রয়োজনে ব্যবহার করা। এই সংরক্ষিত জল প্রবাহিত হয়ে নদী বা সমুদ্রে যেন মিশে যেতে না পারে। বৃষ্টির জল ধরে রাখার বা সংরক্ষণের দুটি সহজ উপায় হল বাড়ীর ছাদে উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সঞ্চয় এবং স্থানীয় ছোট জলাশয়গুলি সংস্করণ করে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ। তবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ পদ্ধতি আজও যে ব্যাপকভাবে হচ্ছে না তার প্রধান কারণ যেমন জলসংকটের ভয়াবহতা বুঝতে না পারা, তেমন অন্যতম কারণ হচ্ছে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাব। বৃষ্টির জল সংরক্ষণের উপযুক্ত সহজ প্রযুক্তি সকলের নাগালের মধ্যে আনতে পারলে, তা সহজেই সকলে গ্রহণ করবে। বিশুদ্ধ পানীয় জল পেতে যখন এত কষ্ট করতে হয়, সেখানে বিশুদ্ধ জল এত সহজে পাওয়া যাবে সকলেই এই পন্থা গ্রহণ করবে।

বর্তমানে ভারতে জলের চাহিদা প্রায় ৭.৫ কোটি হেক্টর মিটার। ২০২৫ সালে ভারতের জলের চাহিদা হবে ১০.৫ কোটি হেক্টর মিটার। এত পরিমান জল ভূগর্ভ এবং নদী ও পুকুর থেকে নেওয়া হয় তবে বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন ইতিমধ্যেই পরিবেশ তার স্বাভাবিক সুস্থতা হারিয়েছে। ক্রমাগত সঞ্চিত জলের ভান্ডারে আঘাত হানার জন্য। তবে কি বৃষ্টির জল থেকে এই জলের চাহিদা মেটাতে পারবে? হ্যাঁ পারব। ভারতে সারা বছরে গড়ে ৪০ কোটি হেক্টর মিটার বৃষ্টির জল পড়ে। সারা বছরে বৃষ্টির জল বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করলে ভারত কমবেশী প্রায় ১৭.৩ কোটি হেক্টর মিটার জল সঞ্চয় করতে পারে।

—পান্নালাল মনি

৫০ বছর পায়ে পায়ে
মল্লিক সু হাউস
ত্রিবেণী বাজার, হুগলী

New Dynamic Engineer's Co-Society Ltd.
Govt. Contractors
354, Siraj Mondal Rd.
Kanchrapara. Ph: 2585-9243

✆ 25890019(R)
Subrata Das
Club Member Agent
Life Insurance Of India (Kalyani Branch)
Residence: Purbasha, Gokulpur
P.O. Kantaganj- 741250

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
১ ঘণ্টায় রঙিন (ডিজিটাল) ছবি
ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

সমীক্ষা উত্তরবঙ্গে সাপের সংখ্যা হ্রাস : পরিবেশ বিপন্ন

উত্তরবঙ্গে (জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার, উ: ও দ: দিনাজপুর ও মালদহ) সাপের সংখ্যা ভীষণভাবে হ্রাস পাচ্ছে। বনাঞ্চলের পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পাওয়া ও কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে সাপের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী দপ্তরের সর্পবিশারদদের সমীক্ষা অনুযায়ী চন্দ্রবোড়া (Russel's viper), ভারতীয় সাধারণ কালাচ (Indian common krait), ছোটখাটো সাপ (Trinket Snake), দাঁড়াশ সাপ, হলুদ পাথরের মতো বোড়া সাপ (yellow pit viper), যথেষ্ট পরিমাণে কয়েকবছর আগে উত্তরবঙ্গের জঙ্গলে পাওয়া যেত। অথচ বর্তমান সমীক্ষায় বন-জঙ্গলের পরিমাণ রকমে যাওয়ার জন্য এদের সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অঞ্চলের সর্পবিশারদ মিন্টু চৌধুরী এক প্রশ্নোত্তরে জানান যে, ১) কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশকের ও রাসায়নিক ব্যবহারের ফলে সর্পপ্রজাতিদের খাদ্যাভাব ঘটছে। ২) কৃষিক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পরিবেশে খাদ্য-খাদকের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। ৩) বনাঞ্চলের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার ফলে সর্পপ্রজাতিদের খাদ্যাভাব ঘটছে। ৪) সর্পপ্রজাতিদের জনন প্রক্রিয়া ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

সমীক্ষায় সাপের সংখ্যা ও প্রজাতি : ১৯৯০-২০০০ সালে বনদপ্তরের সমীক্ষায় বহু নতুন ধরনের সরীসৃপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। সমীক্ষায় জানা যায় প্রত্যেকটি সাপই বনাঞ্চলের জীবকূল-এর ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

২০০৫-২০০৬ সালের সমীক্ষায় মাত্র ১৩ ধরনের সাপ পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৫টি প্রজাতি নতুন ধরনের। গরুমারা, চিলাপাতা, জলদাপাড়া বক্সা, জঙ্গলে এইগুলি লক্ষ্য করা গেছে। এই ৫টি নতুন প্রজাতির সাপগুলি হল— 1. Wild krait (bnungarus caeruleus) 2. Red keeled water snake 3. bandedneck tree snake 4. striped tiger snake. 5. Horse eye snake.

প্রকৃতির ও আমাদের বড় বন্ধু হল সাপ তার প্রমাণ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি

সাপ কীটপতঙ্গ ও পচনশীল খাবার খেয়ে পরিবেশকে রক্ষা করে।

১) Sand boa, John's sand boa, (বিষহীন ময়াল বা অজগর, দাঁড়াশ ইত্যাদি সাপ) সাপগুলি পরিবেশে শষ্য ক্ষেত্রে ইঁদুর খেয়ে মানুষের উপকার করে। শষ্যক্ষেত্রে এই সাপের সংখ্যা হ্রাস পেলে ধান ও অন্যান্য শষ্যের উৎপাদন ভীষণভাবে হ্রাস পাবে। পরিবেশের স্বার্থে এই সাপগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। সাপের সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ার ফলে ইঁদুর-এর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ফলে শষ্যক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে।

২) 'Antivenin'— জীবনদায়ী ওষুধ সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে, কোবরা ভেনম্ ব্যাথা উপশমে (Pain Killer), চন্দ্রবোড়ার ভেনম (বিষ) দাঁতের শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় (অতিরিক্ত রক্তপাত বন্ধ করার জন্য)।

৩) সাপের বিষ (যেহেতু হিমোটক্সিন ও নিউরোটক্সিন, তাই এই বিষের সাহায্যে নিত্য নতুন বহু ওষুধ তৈরি হচ্ছে।

৪) পরিবেশে খাদ্য খাদক, খাদ্য শৃঙ্খলে সরীসৃপ প্রজাতির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই সাপ সম্পর্কে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে। প্রতিটি সাপকেই পরিবেশে রক্ষা করতে হবে, নতুবা পরিবেশে ভারসাম্য বিঘ্ন ঘটবে। পাশাপাশি নানা ধরনের সমস্যা তৈরী হবে।

আমাদের বিজ্ঞানকর্মীদের সাপ সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি বিষধর সাপের কামড়ের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ওষুধ যাতে সর্বত্র সরবরাহ থাকে সেদিকে সর্বদা নজর রাখতে হবে।

সাপ সম্পর্কে যে তথ্যগুলি প্রচার করা দরকার —

১) বিষধর সাপের কামড়কে সনাক্তকরণ, দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার পর হাসপাতালে পাঠাতে হবে যেখানে অ্যান্টিভেনিন সিরাম ইনজেকশন সহ সাপের কামড়ের চিকিৎস ব্যবস্থা রয়েছে। ২) সাপ প্রকৃতির বন্ধু কখনই একে মারা উচিত নয়। ৩) শস্যক্ষেত্রে কীটনাশক ব্যবহারের পরিবর্তে জৈব নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু প্রয়োজন। দীর্ঘদিন জমিতে (চাষের) কীটনাশক ও রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে উপকারী বহু কীটপতঙ্গ মারা যায়। পাশাপাশি কীটনাশক ও রাসায়নিক সারের বিষক্রিয়া নষ্ট হয় না। ফলে জমিতে যেসব সাপ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে সেগুলি খাদক না পেয়ে মারা যায়। ফলে জমিতে ইঁদুরের উপদ্রব বেড়ে যায় এবং ফসলের ভীষণ ক্ষতি হয়। তাই শস্যক্ষেত্রে দাঁড়াশ সাপের চাষ বাড়াতে হবে। দাঁড়াশ সাপের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে না পারলে জমিতে ইঁদুরের আক্রমণ বাড়বে, পাশাপাশি জমির ফসলের উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতি হবে। ৪) জেলাভিত্তিক সাপের মানচিত্র বনদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রচার করতে হবে। নির্বিষ ও বিষধর সাপের তালিকা প্রচার করতে হবে। ৫) নির্বিষ সাপের কামড়ের চিহ্ন ও লক্ষণ, ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ। বিষধর সাপের কামড়ের চিহ্ন ও লক্ষণ ভালোভাবে প্রচার করতে হবে। ৬) নির্বিষ ও বিষধর সাপে কামড়ালে কি করবেন— স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

—জয়দেব দে, বিজ্ঞানকর্মী। ফোন : ৯৪৩৩০৫৬০

তথ্যসূত্র : Wild life wing, forest Dept. Govt. of W.B.

পত্রিকা যোগাযোগ

বিজ্ঞান দরবার— কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা।
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা— চাকদহ, ফোন : ০৩৪৭৩২৪৩৩২৯
ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা— ত্রিবেণী, ফোন : ২৬৮৪-৫৫৫৪
হরিণঘাটা অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বিরোধী কমিটি — ফোন : ২৫৮২-১১২৯
কোচবিহার— কাছারিমোড় (নিউজপেপার এজেন্ট), নীলকুঠি।
জলপাইগুড়ি— স্বপন মুখার্জি, ১৭৫/এ, অরবিন্দ কলোনি, আলিপুর দুয়ার জং।
কলকাতা : বুকমার্ক, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কল-৭৩

যোগাযোগ : বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জি রোড, পো: কাঁচরাপাড়া- ৭৪৩১৪৫, উ: ২৪ প:। ফোন : ২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৩৩০৫৬০৭৮।
সম্পাদক মণ্ডলী— পান্নালাল মান্নি (সহ সম্পাদক), শমিত কর্মকার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, সলিল কুমার শেঠ।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পো: কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো: কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা। ফোন: ৯২৩১৬৭৫২৩৬ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক— শিবপ্রসাদ সরদার। *(ফোন : ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.